ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধু

* আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি

"My 'strength' he used to say, is that 'I love my people. My weakness is that I love them too much."- Bangladesh: A Legacy of Blood, Anthony Mascarenhas

Abstract: *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all times, is the Father of the nation and founder of independent Bangladesh. He has a long continuous history of struggle for the righteous cause of the people of the then East Bengal/East Pakistan. Through his noble efforts and unfettered love for this soil, he reached up to the sky high level of excellence. He was the most courageous leader of his time and beyond, so far history of Bengal has ever witnessed. He had an emotional aesthetic mind and a very big heart to love all his people without any sort of discrimination or parochialism. He had a charismatic leadership quality and personality and was an architect of preparing fearless successors. He is believed to have a supernatural sort of power to judge things blending with width of heart and wisdom. He involved himself with politics since early 1940s and was a self-made personality having renowned political figure H.S. Shurawardy as his mentor. He led the Bangalee nation towards independence gradually from 1948 to the culmination point of 26th March 1971. Being the Father of the nation, he had the opportunity to serve Bangladesh from 1972 to August 1975. The cruel death, plotted by some heinous miscreants snatched him away from us. But still he is alive in the heart of millions of Bangalees in home and abroad. In this article a short synopsis of his dreams and realities have been depicted with objectivity and admiration. The secret philosophy of his life and love for Bangalee People is 'I love my people. My weakness is that I love them too much'.*

একজন সত্যাদর্শী রাজনীতিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে সাহস, সততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বঞ্চনার ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকার সাবলীল ভাষায় ১৯৫৫-১৯৫৬ সময়কালে পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে অকাট্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন, তা আমাদের অভিভূত করে। জন্ম তারিখ হিসাব করলে বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন ৩৬ বছর। ৩৬ বছরের একজন তরুণ যে চমৎকার প্রজ্ঞা ও তেজস্বীতার সাথে অপরিমেয় দুঃসাহসী আত্মবিশ্বাস নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। শাসনতান্ত্রিক পরিষদে দেয়া বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যগুলোর পুরোপুরি সংকলন ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগুলো এক দুর্লভ

রেক্টর (সরকারের সচিব), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, ঢাকা

দলিল। সত্যি বলতে কী, এসব বক্তব্য থেকে অনুমিত হয়, বাংলাদেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর হৃদয়জাত নিখাদ ভালোবাসা কত নিবিড় ও প্রবল ছিল। ছিল দুকূলপ্রসারী সমুদ্রের জলরাশির মতো। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৪৬-৭০ সময়কালের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। যা কিছু হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে, বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। কাউকে অযৌক্তিকভাবে ছোট করা হয়েছে, কাউকে সীমারেখার উর্ধ্বে তুলে বড় করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে সময়ের কথা আমরা বললাম, সে সময়ের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করলে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ব্যাপ্তি ও সৎ সাহসের অদৃশ্য পরিমন্ডল নিঃসন্দেহে উন্মোচিত হবে। বাংলা-বাঙালীর প্রতি চিরায়ত মোহাচ্ছন্ন ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু অনেক রথী-মহারথীকে অতিক্রম করে গেছেন, পৌঁছে গিয়েছিলেন আকাশ ছোঁয়া নান্দনিক মর্যাদা ও উচ্চতায়। আসল কথায় ফিরে আসি। আমরা এ নিবন্ধে মানুষ বঙ্গবন্ধুর আসল প্রতিকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। একটি বিষয় ইদানীং লক্ষ্য করি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হন। এখানে দুধরণের লেখক-সমালোচক রয়েছেন। একদল অন্ধস্তাবক, আরেকদল অসাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত জাত শত্রু-বস্তুনিষ্ঠতার মানদন্ডে দুটিই অগ্রহণযোগ্য। বঙ্গবন্ধুকে দেখতে হবে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধা হিসেবে। তাঁকে দেখতে হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে তৃতীয় নয়নে। আসলে বঙ্গবন্ধুর সাথে কারো তুলনা চলে না। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সারা বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালী জাতি তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধুর মাঝে দেখতে পেয়েছিল। একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই, বঙ্গবন্ধু সৌভাগ্যক্রমে এক ঝাঁক বিশ্বস্ত সহকর্মী পেয়েছিলেন। যারা তাঁর হাতে হাত রেখে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করে বাঙালীর স্বাধিকার, ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যাত্রাপথ সহজ করে দিয়েছিলেন। তাদের অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহিরুহের সমতূল্য। তাঁরা আজ বেঁচে নেই। মনে রাখতে হবে, আমরা যেন তাঁদের ভুলে না যাই, কোনভাবে তাঁদের খাটো না করি। সত্যি কথা বলতে কী বঙ্গবন্ধু ছিলেন নেতৃত্ব তৈরির কারিগর। তাই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের হাতে বন্দী থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধ থেমে থাকেনি। তাঁর সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবের অবর্তমানে তাঁর নির্দেশনায়, তারই নামে যুদ্ধ হয়েছে। তাঁর মহান সহকর্মীদের মধ্যে জাতীয় চার নেতার কৃতিত্ব ও অবদান আজ ইতিহাসের অংশ।

বঙ্গবন্ধু অতি উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে সমাহার ঘটেছিল চমৎকার মানবিক মূল্যবোধ। বাহ্যত বজ্রকঠিন মনে হলেও তাঁর ছিল একটি অতি সংবেদনশীল কোমল হৃদয়। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রচন্ড অনুরাগ ছিল। পরম শত্রুর প্রতিও সদয় হতে তাঁর কখনো বাঁধেনি। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয় দিয়ে বিচার করার এক অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ছিল তার প্রবল অনুরাগ। কলিম শরাফীর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে বঙ্গবন্ধু ভীষণ ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান শুনতে শুনতে অনেক সময় তিনি

আবেগের আতিশয্যে অশ্রুসজল হয়ে পড়তেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও উদার। কোন রকম সাম্প্রদায়িক কূপমন্ডূকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাঙালী জাতীয়তাবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু হিন্দু-মুসলমানে কখনো বিভেদ সৃষ্টি করেননি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি জীবনের শুরু থেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সে প্রেক্ষিতে প্রথাগত পড়াশুনায় পর্যাপ্ত সময় দেয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত। ১৯৯৯ সালে লেখক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় গিয়েছিলেন। পৈত্রিক বাড়ীতে আলমিরা ভর্তি বঙ্গবন্ধুর সংগৃহীত পুস্তক পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে তাঁর যে জ্ঞানচর্চার প্রতি সহজাত প্রবল আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সমাহার রয়েছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে আগমন ও বিকাশ। রাজনীতির মূল পাঠ বঙ্গবন্ধু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে আজীবন সম্মান করেছেন। সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের প্রবক্তা বিভাগ পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের রাজনীতির ক্লাসে তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলতে গেলে তার রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রসঙ্গটি আবশ্যিকভাবে এসে যায়। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উদার ও প্রশান্ত মনের নির্ভীক মানুষ। এই আত্মভোলা মানুষটি নিজের জন্য কিছুই করেননি। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে পূর্ব বাংলার বঞ্চিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশ বিভাগের সময় যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সাধনা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিন বছর ভারতে অবস্থান করে সেখানকার মুসলমানদের জীবন রক্ষা ও পাকিস্তান-ভারতে সংখ্যালঘুদের জানমাল সুরক্ষার জন্য নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন হিন্দু- মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তি মিশনের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ভারত-পাকিস্তান ছোটাছুটি করে উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের জানমাল হেফাজতের আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে জনাব সোহরাওয়ার্দী ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে আগমন করেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথমে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা শামসুল হক সাহেব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তার স্নেহধন্য শেখ মুজিবুর রহমান আবার একই পতাকাতলে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু চিন্তা-চেতনায় আজীবন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু শহীদ সাহেব সম্পর্কে

সশ্রদ্ধ উচ্চারণ করেছেন। আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি-"শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন"।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' যা কিনা ১৯৬৬-৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি রচনায় হাত দিয়েছিলেন; সমসাময়িক ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য অপরিসীম। এই আত্মজীবনী লেখার পেছনে শহীদ সাহেবের স্মৃতি তাঁকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক Mentor শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালে বৈরুতে পরলোক গমন করেন। আইয়ুবের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে শুনা যাক-"একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল। কেমন করে তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল লিখতে ভাল না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি।..... তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম"।

বাংলা নামে দেশ গড়ার ইতিহাস রয়েছে। ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার বিরুদ্ধে যৌক্তিক ভাষায় বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "The word Bengal has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted"। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তর করেছিল। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু কখনো ভুলেননি। তাই দেখা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এখন থেকে আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, দেশটার নাম হবে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- "এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে...। একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই...। আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ।"

জ্ঞানতাপস জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক 'Muzaffar Ahmed Choudhury Memorial Lecture 1980'-এর ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস থেকে প্রায় নির্বাসিত। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক। প্রফেসর রাজ্জাক তার 'Bangladesh State of the

Nation' বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন-"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। দেশপ্রেমের সংজ্ঞাকে যতো ব্যাপক করে তোলা যাক না কেন, বঙ্গবন্ধু ততোখানিই তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন। যে প্রেম তাঁকে বিহ্বল করেছিল, তা দেশের প্রতি যে হালকা আবেগ আমরা অনুভব করি এবং যাকে দেশপ্রেম হিসেবে চালিয়ে থাকি, তার থেকে অনেক বেশি আলাদা। বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মুসলমান, অনেক ক্ষেত্রে, প্রায় বিশুদ্ধবাদী মুসলমান ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম লীগের একজন অনুগত সদস্য ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার সোৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে কাজে অংশগ্রহণও করেছিলেন। শেষের অনেক আগেই তিনি তাঁর অন্তিম এবং চিরন্তন ভালোবাসার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। পৃথিবীর সেই ছোট্ট অংশটার প্রেমে তিনি বিহ্বল ছিলেন, যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। এ ধরণের ভালোবাসা বিপজ্জনক হতে পারে। বঙ্গবন্ধুই তার প্রমাণ"।

প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনাও করেছেন তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে তিনি বোধ হয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি বঙ্গবন্ধুর মাঝে বাঙালী জাতির প্রাণের স্পন্দন প্রকাশের আর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার ভাষায় "এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোন কোন বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এসব কিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্খার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল"।

বাংলার দুজন অবিসংবাদিত নেতার মধ্যে বাঙালীত্ব ও মুসলমানত্বের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। একজন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও অপরজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেরে বাংলা সম্পর্কে তার শিক্ষক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদকে বলেছিলেন- "ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙ্গালী। সেই সঙ্গে ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙ্গালীত্বের সাথে খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নাই। ...খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের সমন্বয়ই ভবিষ্যত বাঙ্গালীর জাতীয়তা। ফজলুল হক ঐ সমন্বয়ের প্রতীক। এ প্রতীক তোমরা ভেংগোনা। ফজলুল হকের অমর্যাদা তোমরা করোনা। ....বাঙ্গালী যদি ফজলুল হকের মর্যাদা না দেয়, তবে বাঙ্গালীর বরাতে দুঃখ আছে"। শেরে বাংলা ১৯৩৭ সালে তার দল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। হয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৮

সালে কৃষক প্রজা পার্টি হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করে। বঙ্গীয় কংগ্রেস তাতে পূর্ণ সমর্থন দেয়। অনাস্থা প্রস্তাবে কৃষক প্রজা পার্টি হেরে যায়। তখনকার পটভূমিতে আচার্য পিসি রায়ের এ ভবিষ্যতবাণী। ১৯৪৩ সালে ফজলুল হক দ্বিতীয় মেয়াদে বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনি ক্রমশ পর্দার অন্তরালে চলে যেতে থাকেন। মি. জিন্নাহর সুচতুর চাল, বাংলার রাজনীতিতে খাজা-নবাবদের উত্থান, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচন্ড গতিশীলতা, হক সাহেবের এক বুক অভিমান, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে দৃশ্যান্তরে চলে যান। ফলশ্রুতিতে একক নেতা হিসেবে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের আস্থাভাজন আর কেউ রইলোনা। তাই ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি। তবুও বাংলার সাধারণ মানুষ ফজলুল হককে কত বেশী ভালবাসতো বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-"শেরে বাংলা মিছামিছিই শেরে বাংলা হন নাই। বাংলার মাটিও তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাঁধা পেয়েছি।" বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন-"একদিন আমার মনে আছে, একটা সভা করেছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন। কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ একজন বৃদ্ধলোক যিনি আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, দাঁড়িয়ে বললেন- যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামওতো শুনি নাই। আমাদের গরীবের বন্ধু হক সাহেব।" বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ১৯৬৯ সালের দিকে লেখা। তখন হক সাহেব জীবিত নেই। বঙ্গবন্ধু আজীবন ফজলুল হক সাহেবের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। ফজলুল হক সাহেব ও বঙ্গবন্ধুকে স্নেহ করতেন অকৃত্রিম পুত্র বাৎসল্যে।

আগেই বলেছি, ফজলুল হক ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালী ও মুসলমান। হক সাহেবের পর ইতিহাসের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাব। বাঙালীত্বের ও মুসলমানত্বের সহজাত গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়া, সংস্কৃতি ভাবনা সব মিলিয়ে ফজলুল হকের পর বঙ্গবন্ধু একমাত্র নেতা, যার মধ্যে বাঙালী জনগোষ্ঠী তাদের মুক্তির দীপশিখা প্রত্যক্ষ করেছিল। পাকিস্তানের রাজধানী করাচী তার কাছে ভাল লাগে না। কেননা ওখানে বাংলার চোখ জুড়ানো শ্যামলিমা নেই। রাজবন্দী হিসেবে জেলে থাকতে তার আপত্তি নেই, যদি সে জেল বাংলার জেল হয়। পাঞ্জাবের জেল তার পছন্দ নয়, কেননা মাংস-রুটি খেতে তার ভাল লাগে না। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর ওপর হয়েছে। তার জীবনের সোনালী দিনগুলো কেটেছে পাকিস্তানের জেলে মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে। ফাঁসির রজ্জু তার মাথার ওপর ঝুলেছে। দুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি ফিরে এসেছেন। প্রথমে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার

এক নম্বর আসামী হিসেবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। ফাঁসির সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এ অন্যায় মামলার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল পূর্ব বাংলা। তাদের মুখে একটাই শ্লোগান- 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। প্রচন্ড গণবিদ্রোহের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল আইয়ুবের সাজানো মামলা। পালিয়ে বাঁচলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারক এস, এ রহমান। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব নিঃশর্তভাবে তুলে নিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মুক্ত হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী। দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা, যুদ্ধ ঘোষণাসহ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির আদেশ দেয়। ততদিনে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন নখ-দন্তহীন এক জেনারেল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে অস্বীকার করায় অলৌকিকভাবে বঙ্গবন্ধু ফাঁসির মঞ্চ হতে ফেরত আসেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। তাকে অত্যন্ত গোপনে পিআইএর বোয়িং ৭০০ যোগে লন্ডনে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তাঁর সাথে ছিলেন এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী। ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ Royal Air Force-এর কমেট বিমানে লন্ডন ত্যাগ করেন। ১০ জানুয়ারি দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছেন।

১০ জানুয়ারি অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানযোগে তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমান থেকে নেমেই তিনি দেশের মাটি ছুঁয়ে শপথ করেন। হয়তোবা গুনগুন করে গাইতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের সেই গান "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা.."তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তাঁকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সে মহাসমাবেশে আবেগাপ্লুত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিঃ "গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দূর্গ গড়ে তোল'। আজ আবার বলছি 'আপনারা একতা বজায় রাখুন।' আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।"

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যত অনুসরণীয় আদর্শ কি হবে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন- "সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের

পরিহাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে ২৪ বছরে ধর্মের নামে যেসব অধর্মের কাজ পাকিস্তানী শাসকচক্র করেছিল, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। রাষ্ট্রের ওপর ধর্ম অযাচিত হস্তক্ষেপ করুক, এটা বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সমর্থন করতেন না। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল। বঙ্গবন্ধু জানতেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকল ধর্মের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের নিজ-নিজ ধর্ম পালন করবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেন- "আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি... এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।"

এবার স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু যা করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করব। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যা কিছু দরকার, বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছর সময়কালে সবকিছু করেছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, পরিকল্পনা ব্যবস্থা সবকিছু তিনি ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রণিধানযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। জেনারেল নিয়াজী ও তার সেনাদের আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনীর কয়েক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে রয়ে গিয়েছিল। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হবার সম্ভাবনা ছিল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেখ মুজিবুর রহমান খুব ভাল করে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কোলকাতা সফরে গেলে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একান্ত বৈঠকে তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার প্রভাব ছিল ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির লক্ষ্যে সে আলোচনার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরছি:

> "**শেখ মুজিবঃ** মাদাম, আপনি কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন।
>
> **ইন্দিরা গান্ধীঃ** বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে আছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা

হবে।

শেখ মুজিবঃ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ত্রিশ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেক লোকের মৃত্যু হয় আমি সে অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধীঃ এক্সেলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

শেখ মুজিবঃ মাদাম, কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন।

ইন্দিরা গান্ধীঃ এক্সেলেন্সি, প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন।"

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বড় সাফল্য হলো জাতিকে নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেয়া। ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে Constituent Assembly গঠন করা হয়। পৃথিবীর সমুদয় উত্তম সংবিধান পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংবিধান কার্যকর করা হয়। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয়। ৭২-এর সংবিধানকে অদ্যাবধি একটি উৎকৃষ্ট সংবিধানের প্রতিকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সংবিধানের প্রণিধানযোগ্য বিশেষত্ব হলো Fundamental Rights বা মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহ। এই সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে- Freedom of thought and conscience is guaranteed অর্থাৎ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো। একটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র হিসেবে এ শাসনতন্ত্র বিশ্বের শাসনতন্ত্র বিশারদদের প্রশংসা অর্জন করে। সংবিধানের ১৫৩(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলায় একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকবে। আরো উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। এটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে পরিকল্পিত অর্থনীতির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫-এ বলা হয়েছে- "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন...."। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু ছয় দফা

ভিত্তিক যে দ্বি-অর্থনীতির প্রস্তাব করেছিলেন, তার পিছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একঝাঁক তরুণ শিক্ষক। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজিত বৈষম্য ও তার বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে দুই অর্থনীতির ধারণা বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে তারাই সামনে নিয়ে আসেন। এতে সারা পাকিস্তানে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যারা রাজনীতিবিদদের সহায়তা করতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর মাহফুজুল হক, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর মোশাররফ হোসেনসহ আরো অনেকে।

ইতিহাসের অংশ হিসেবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রেক্ষিতে জনগণের প্রতি প্রদত্ত ম্যান্ডেটের অংশ হিসেবে ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে দুটি কমিটি করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক স্টিয়ারিং গ্রুপ গঠন করা হয়, তাতে সদস্য ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও ড. কামাল হোসেন। সংবিধানের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব ছিল ড. কামাল হোসেনের ওপর। তার পাশাপাশি একটি পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ গ্রুপে ছিলেন প্রফেসর মুজাফ্ফর আহম্মদ, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ ও প্রফেসর নুরুল ইসলাম। ছয় দফার ভিত্তিতে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে। অনুলিপি গোপনীয়তার সাথে ড. কামাল হোসেনের কাছে সংরক্ষিত থাকত। খোন্দকার মোশতাক ঘন ঘন অনুলিপি ধার নিতেন। এ সংবিধানের কিছু মৌলিক বিষয়ে তিনি একমত ছিলেন না। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের কোন একটি পত্রিকায় ছয় দফার মূল বিষয়গুলো ছাপা হয়ে যায়। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে হৈ-চৈ পড়ে যায়। খসড়া সংবিধান ফাঁস হওয়ায় সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতির সুযোগ পেয়ে যায়। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে ছয় দফা ভিত্তিক প্রস্তুত সংবিধানের খসড়া ফাঁস করার কাজটি হয়তোবা খোন্দকার মোশতাকই করেছিলেন।

আসল কথায় ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজানো হলো। অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো। প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান ও প্রফেসর মোশাররফ হোসেনকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ দেয়া হলো। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকলো। পরিকল্পনা কমিশন কঠোর পরিশ্রম করে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮' প্রণয়ন করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর মুখবন্ধে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে- A plan

for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh বলে অভিহিত করেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ কথা নয়। পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন জরুরী। তাই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন- No plan however well formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices"

পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার শাসনকালের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। বিষয়গুলো তার Making of a Nation Bangladesh: An Economists Tale পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ১৯৭২ পূর্ববর্তী সময়কাল সম্পর্কে তার মতামত বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ। তিনি বলেছেন- "৭১ পূর্ববর্তী সময়টায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান অব্যাহতভাবে যে দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন, তা লক্ষ্যণীয়। এই মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি অন্য কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনে দেশকে সংগঠিত ও উজ্জীবীত করার ক্ষেত্রে তার সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক উপরে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় অবশ্য পরিস্থিতি রাতারাতি পাল্টে যায়। চ্যালেঞ্জগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনেক বিচিত্র বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার বিষয়ে তার করণীয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো তার সময়কালে দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি কোনটাই তার অনুকূলে ছিল না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিদেশী নেতৃবৃন্দের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর ইসলামের মন্তব্য হচ্ছে "বিদেশী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনে দায়িত্ব পালন করার সময় আমি তার সকল বিদেশ সফরে সঙ্গী ছিলাম। আমি দেখেছি যে, বিভিন্ন বিদেশী নেতাদের সাথে বৈঠক, আলোচনা ও সমঝোতার সময় তিনি অনেক বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে কথোপকথন চালিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর আন্তরিক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের গুণে ঐ সব নেতাদের সঙ্গে দ্রুত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন"। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জোট নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী ছিলেন। যদিও Strategic কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টির আলাদা Prespective রয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টির একটা আলাদা Implication ছিল। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থান ছিল জোরালো জাতীয়তাবাদী ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। প্রফেসর নুরুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেন-".... কোন দেশের

আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তিনি কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে যে কোন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয়টি হচ্ছে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং একই সঙ্গে তিনি এটাও বিবেচনায় রাখতেন যে, এ সম্পর্কের কারণে যাতে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।" ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুরের নিজস্ব নীতি ও ধ্যান ধারণা কাজ করেছে। তিনি সব সময় বাংলাদেশের স্বার্থকে তুলে ধরতেন। প্রফেসর ইসলামের মতে "শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে সে ধরণের সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিতেন, যেগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হতে পারে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সার্বিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের যুদ্ধে তার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার কারণে শেখ মুজিবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।"

পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। পরিকল্পনা কমিশনে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন আরেকজন অর্থনীতিবিদ ছিলেন প্রফেসর আনিসুর রহমান। তিনি স্বাধীনচেতা ও মেধাবী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রফেসর আনিসুর রহমানের সাথে এটিই বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ। স্থান পরিকল্পনা কমিশন। সাথে ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুকে দেখার পর প্রফেসর আনিসুর রহমান তার ভেতরের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন এভাবে- "As my first meeing with the 'Father of the Nation in independent Bangladesh' it was a rather enotional meeting on my part. This great leader with his extraordinary leadership and charisma mobilized the people of Bangladesh for a War of Independence initially with only bamboo sticks in their hands, and it is the strength of determination of our people thus awakened that finally got us our independence".

প্রফেসর আনিসুর রহমান নিখাদ দেশপ্রেমিক। তিনি দেশের মঙ্গল চান। আনিসুর রহমান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেশ গড়ার বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি দৃঢ় আবেগের সাথে বললেন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থেকেও জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের অমর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন। দেশ আজ স্বাধীন। এখন দেশ গড়ার সময়। তিনি বঙ্গবন্ধুকে একই Charisma ব্যবহার করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও জাতিগঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে দু'জনের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেশ গড়ার কাজে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আনিসুর রহমানের এক অভিনব পরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে তিনি আবেগাপ্লুত

ভাষায় বললেন- .....You imagine that you are physically leading the liberation war. You know that this was not conventional war, this was guerrilla war, Imagine that you are moving with the people from village, from jungle to jungle, as a guerrilla leader, people of the villages, poor people, are giving you shelter, you are sharing with all others whatever food they eat, sometimes going hungry when they have no food and yet inspiring everyone to go on fighting. Sometimes you have nowhere to stay, and are spending the nights with your comrades in the woods or in the field. After fighting in this way for nine months you finally emerge victorious and take charge of running the independent country. The nation now expects from you that what you would have done then. বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন- "What would I have done?" আনিসুর রহমান বললেন-" It will be insolence on my part to say anything more. You have to close your eyes and enter into that process. And you have to do that which you would have done coming out of that process." আনিসুর রহমান লিখেছেন-আমি দেখলাম জাতির পিতার অবয়ব রক্তিমাভ হয়ে উঠছে। আমি কিছুটা শংকা বোধ করলাম। আনিসুর রহমানের তখনকার অনুভূতি হচ্ছে- I had released my pent up emotion of many days by telling him all this in this way, and hoped that he did not mind" বঙ্গবন্ধু বললেন- Of course, why should I mind, This is why I have kept you all do come from time to time and advise me". । এখানেই বঙ্গবন্ধুর মাহাত্ম্য। আলোকিত গুণীজনদের সম্মান করতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। বিনিময়ে উদারনৈতিক মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন চিরদিন। স্বাধীনতা উত্তর জাতি গঠনকালে এক কঠিন সময়ে অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমানের সাথে বঙ্গবন্ধুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার আকরগ্রন্থ তারই লিখিত Though Moments in History-Memoirs of Two Decades of Intellectual and Social life (১৯৭০-১৯৯০) ।

প্রফেসর আনিসুর রহমান ও বঙ্গবন্ধুর কথা যখন এসেছে, আরেকটি বিষয় বলে এ বিষয়ের ইতি টানবো। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাস। একদিন জাসদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর রহমানের বাসায় এসে হাজির। তাঁর ছাত্র হিসেবে দাবী করে অনুরোধ করলেন- "স্যার আপনি খুব স্বাধীনচেতা লোক, আপনি তাদের দল করেন না। জাসদ ১২ মে রমনা মাঠে র‍্যালির আয়োজন করেছে। আপনাকে ঐ র‍্যালিতে বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ করছি"। প্রফেসর আনিসুর লিখেছেন- "In principle I would have no objection to addressing your rally, but I am still a Member of

the Planning Commission even if honorary, and you are asking for the Prime Minister's blood on the streets. In this situation there is a question of decorum in my attending a public rally of your party." । তিনি এও বললেন, যেহেতু তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, তার র‍্যালিতে যোগদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। পরবর্তী দিন তিনি বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানালেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন যে- "But I told him also that you would give your permission, because you believe in democracy." । প্রফেসর আনিসুর রহমান লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ ভাবলেন। সামনে রাখা কাগজগুলোতে কিছু একটা আঁকাঝোকা করলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন- "You....may...go. There are some good boys and girls in their party, no harm if they hear some good words from you on national building." । প্রফেসর আনিসুর রহমান যথারীতি জাসদের সভায় যোগদান করেছিলেন। পাঠ করেছিলেন তার লিখিত বক্তব্য। জাতি গঠনের কাজে শরীক হতে সবাইকে আবেদন জানালেন। বঙ্গবন্ধুর বাস্তব জ্ঞান ও মহানুভবতা কত উচ্চ ছিল আজকের দিনে তা ভাবাও অসম্ভব। রাস্তায় যারা বঙ্গবন্ধুর রক্ত চাচ্ছে, তাদের র‍্যালীতে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিকল্পনা কমিশনের একজন দায়িত্বশীল সদস্যকে অনুমতি দিয়েছেন। এটা সত্যিই অবাক ও বিস্ময়কর। দেশকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা ও ভবিষ্যতের মঙ্গল প্রত্যাশায় একান্ত বিভোর ছিলেন বিধায় বঙ্গবন্ধু এ অনুমতি দেয়ার মতো দূরদৃষ্টি ও মহানুভবতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন একটি সুষম ও উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল ও বাংলার মানুষের মুক্তি সম্ভবপর নয়। একটি স্বচ্ছ, সৎ ও দক্ষ জনপ্রশাসন তার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সাথে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে সরকারী কর্মচারীদের সংজ্ঞা, দায়িত্বাবলী, নিয়োগ পদ্ধতি, নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতার নীতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সন্নিবেশ করা হয়। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত বিধান সংযুক্ত করা হয়- "Subject to the provisions of this Constitution Parliament may by law regulate the appointment and conditions of service of persons in the service of the Republic: Provided that it shall be competent for the President to make rules regulating the appointment and the cinditions of service of such persons until provision in that behalf is made by or under any law, and rules so made shall have effect subject to the provisions of

any such law."

প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে Administrative and Services Reorganisation Committee (ASRC) গঠন করেন। এ কমিটিতে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আনিসুর রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আঞ্চলিক দেশসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনান্তে কমিটি ১৯৭৪ সালে বালাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে তাদের রিপোর্ট জমাদান করে। ASRC-এর একটি উল্লেখ করার মত বিষয় হলো তাদের প্রতিবেদনে প্রথম শ্রেণীর পদে কোনরূপ কোটা ব্যতিরেকে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। উর্ধ্বতন পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতির জন্যও এ কমিটি সুপারিশ করে। একজন গবেষকের ভাষায়- The ASRC identified the fact that lack of professionalism had been the major defect in Civil Service and suggested for developing professionalism in BCS. ASRC explored that Knowledge is an indispensable element of achieving professionalism in Civil Service. Knowledge can be generated "through the study and practice of administration of the relevent area for a longer period of time, some cases, at least long enough to amount to a commitment- a proffessional commitment." It drew attention to the need for matching each job with the man who possessed the needed qualification, experiences, competence and for special measures required to build up new skills and expertise which are still relevent in the present day context. It recommended that to achieve the objectives, a radical change would be needed in the practices that are followed in staffing higher administrative positions. বঙ্গবন্ধু ASRC সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বল্পকালের ব্যবধানে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ASRC Report হিমাগারে চলে যায়।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জাতীয় বেতন কমিশন গঠন ও তার রিপোর্ট বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ২২০৮টি বেতনস্কেল লাভ করেছিল। বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ নৈরাজ্যকর। সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রত্যাশা ছিল একটি সুষম বেতনস্কেল। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির পক্ষে অত স্বল্প সময়ের মধ্যে সমন্বিত বেতন কাঠামো প্রণয়ন নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই তারিখে প্রথম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়। প্রফেসর মুজাফ্ফর

আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গঠিত ASRC এর সুপারিশের আলোকে জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক সচিব এম. এ. রবের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটিতে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন পুলিশের সাবেক আইজিপি আলমগীর কবির, অর্থনীতিবিদ ড. আজিজুর রহমান খান, জনাব জহুরুল হক, বুয়েটের অধ্যাপক ড. এম, এ, রশীদ, কাজী আনোয়ারুল মামুন, কর্নেল জিয়াউর রহমান, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট সাইফুর রহমান, যুগ্ম-সচিব কিউ এম, এ রহিম ও সরকারের সচিব গোলাম মোস্তফা। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের মতে "সত্যি কথা বলতে কি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধার অনুসন্ধান করেই বঙ্গবন্ধু এ কমিশন গঠন করেছিলেন প্রশাসনের চলমান হতাশা দূর করে আমলাতন্ত্রকে একটি গতিময় সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে।" জাতীয় বেতন কমিশন জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারের সামর্থ্য, সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস, সরকারি খাতে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা ও সরকারি কার্য সম্পাদনে প্রণোদনার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ১৯৭৩ সালে ২০ মে তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটি পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২২০৮টি স্কেলকে একীভূত করে মোট ১০টি গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কেলের পার্থক্য ছিল ১:১৫.৩৮। সর্বোচ্চ বেতন ছিল ২০০০.০০ (নির্ধারিত) এবং সর্বনিম্ন বেতন ছিল ১৩০.০০। এভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার অতি অল্পসময়ের মধ্যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বেতন কাঠামো প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি অসামান্য সাফল্য হলো ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকল্পে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৮ জন বিদগ্ধ ও শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সদস্য সমন্বয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই এ কমিশন গঠন করা হয়। ১৮৬৫ সালে লর্ড মেকেলে প্রণীত একটি বিতর্কিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল। পাকিস্তান পিরিয়ডে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঐ রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষার ধর্মীয়করণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল মন মানসিকতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের সে উদ্যোগ সফল হয়নি। ড. কুদরত-ই-খুদা ১৯৭৪ সালের ২৪ মে এক যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করে। খুদা কমিশনের সুপারিশের অন্যতম ছিল বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোট ৩টি স্তরে বিভক্ত করে। প্রাথমিক স্তর আট বছর মেয়াদী, প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর চার বছর মেয়াদী, নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুদা কমিশনের অভিমত ছিল "সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার

পরিপ্রেক্ষিতে গঠন বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।" কমিশন কর্তৃক চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সুপারিশ করা হয়। এ স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষাসহ অন্যান্য শাখায় বিভক্ত হয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছরের শিক্ষাক্রম সুপারিশ করা হয়। খুদা কমিশনের রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আশাব্যাঞ্জক পরিবর্তন ও আমূল সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। বিশেষভাবে মানব সম্পদের চাহিদা পরিপূরণের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষার সীমিত সুযোগ পরিপূর্ণ ও সুদক্ষ ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হয়।

এ প্রবন্ধের কলেবর এমনিতে দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আর দীর্ঘতর করা সমীচীন হবে না। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত শ্যামল পলিমাটির কোমল রসে সিক্ত বঙ্গবন্ধু এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসার ও ভালো করার দায়ভার একাই নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি হয়তো তাকে অনুরূপ ভাবতে উৎসাহিত করেছিল। খুব সম্ভব এটাই ছিল তার সীমাবদ্ধতা। বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না, ছিল না কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশা। প্রফেসর কবীর চৌধুরী লিখেছেন- "বঙ্গবন্ধুকে একবার এক বিদেশী সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর প্রধান গুণ হিসাবে তিনি কী চিহ্নিত করবেন। বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা। সেই সাংবাদিক তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আপনার প্রধান দোষ। তার উত্তরেও বঙ্গবন্ধু হেসে বলেছিলেন, দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা।"

প্রয়াত সাহিত্যিক, সাংবাদিক আহমদ ছফা অনেক লেখায় বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করেছেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক ভিন্ন মত এবং ভিন্ন পথ। অতি বামদের দলে ছিলেন আহমদ ছফা। তবে তার স্বপ্ন বিলাসী হৃদয়ে বাংলাদেশের জন্য, বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রচুর ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল। জীবনের উপান্ত বেলায় বঙ্গবন্ধুর এই সমালোচক তাঁর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় তা উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি:

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। যারা এই সত্য অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোন রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হব না। একটি জাতি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে যে সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবকে দিতে হবে। .....আজ থেকে অনেক দিন পরে হয়ত কোন পিতা তার শিশুপুত্রকে বলবেন, জান খোকা! আমাদের দেশে একজন মানুষ জন্ম নিয়েছিল যাঁর দৃঢ়তা ছিল, তেজ ছিল.....। কিন্তু মানুষটির হৃদয় ছিল, ভালবাসতে জানতেন। দিবসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে যে বস্তু চিকচিক করে জ্বলে তা হল মানুষটির সাহস। আর

জ্যোৎস্নারাতে রূপালী কিরণ ধারায় মায়ের স্নেহের মত যে বস্তু আমাদের অন্তরে শান্তি এবং নিশ্চয়তার বোধ জাগিয়ে তোলে তা হল তাঁর ভালবাসা। জান খোকা তাঁর নাম। শেখ মুজিবুর রহমান।"

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫ এইচ.টি.ইমাম, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, আগস্ট ২০১৩।

২. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (১, খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)- সম্পাদনা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২।

৩. আহমদ, আবুল মনসুর (২০১৩) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৪. ইমাম, এইচ.টি (২০১৩) বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স।

৫. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (১৯৯২) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (১ম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ।

৬. চৌধুরী, কবীর (সম্পাদিত) (২০১২) বঙ্গবন্ধু জন নায়ক থেকে রাষ্ট্র নায়ক। ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন।

৭. ছফা, আহমদ (২০১১) নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

৮. হাশিম, আবুল (২০০৭) তাঁর জীবন ও সময়। সম্পাদনা সৈয়দ মনসুর আহমদ। ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

৯. অধ্যাপক রশিদ, হারুন অর (২০১৩) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ। ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১০. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৪) অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১১. সরকার, মোনায়েম (২০০১) বাঙালির কণ্ঠ। সম্পাদনা ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

12. Islam, Nurul (2005) Making of a Nation Bangladesh, An Economist's Tale. Dhaka: University Press Limited.

13. Karim, S.A (2014) Sheikh Mujib Triumph & Tragedy. Dhaka: University Press Limited.

14. Rahman, ndc, A.L.M Abdur (2011) Revisiting BCS Caders: Career Planning for Translational Leadership. M Phill Dessertation. Bangladesh University of Professionlas, Dhaka.

15. Rahman, Anisur (2007) Through Moments in History, Memoris of Two Decades of Intellectual and Social life (1970-1990), Dhaka: Pathak Shamabesh.

16. Razzak, Abdur (2010) Bangladesh State of the Nation. Dhaka:Shahitya Prakash.